এআই সূচিঃ এএসএ ১৩/২৬২৫/২০১৫

১২ অক্টোবর ২০১৫

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি খোলা চিঠিঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে সীমিত যাতায়াত সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা মানাবাধিকারের জন্য গুরুতর উদ্বেগের বিষয়

প্রিয় প্রধানমন্ত্রী

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে (সিএইচটি) পরিদর্শন এবং কার্যক্রম সংগঠিত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য সরকারি নীতিমালার বিষয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল গভীর উদ্বেগের সাথে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছে। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে আপনি যাতে সরকারি নীতিমালা প্রত্যাহার করে, আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানাবাধিকার রক্ষা করতে পারেন, সে দাবি জানিয়ে আমার এই চিঠি।

২০১৫ সালের জানুয়ারী মাসে সর্বপ্রথম জারি করা এই সরকারি নীতিমালা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখে কিছুটা শিথিল করা হলেও[1], এই নীতিমালা মানাবাধিকারের উপর গুরুতর বিধিনিষেধ চালিয়ে যেতে থাকে।

"বিদেশি নাগরিকদের পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন, স্থানীয় আদিবাসী মানুষের সাথে সাক্ষাৎ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন'' এই শিরোনামে এপ্রিল মাসে নীতিমালার সংশোধিত সংস্করণ জারি করে চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠন, বৈষম্য থেকে মুক্তি এসবের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এই বিধিনিষেধের কেন্দ্রে ছিল বিদেশী নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ (এবং কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাধারণ জনগনের মধ্যে) এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের "আদিবাসী" মানুষ, এবং এরকম, যা একেবারেই বৈষম্যমূলক। এই বিধিনিষেধ সমূহ অন্যান্য মানাবাধিকার যেমন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা- সব ধরনের ধারনা এবং তথ্য চাওয়া এবং পাওয়ার অধিকার- এবং গোপনীয়তা এবং পরিবারের বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করতে দেবার অধিকার ইত্যাদিকে হুমকির

[1] প্রত্যাহার করা বিধান গুলোর মধ্যে ছিল ক)আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংগঠন, চিটাগাং হিল ট্রাক্টস কমিশন, 'কমিশন' শব্দটি মুছে ফেলে তার নাম পরিবর্তন; খ) কোন দর্শক আদিবাসীদের সাথে দেখা করতে ইচ্ছুক হলে তা সরকারি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে হতে হবে।

মুখে রেখেছে। এইসব বিধিনিষেধ কেন প্রয়োজন এবং সমানুপাতিক তার ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে এই সরকারি নীতিমালা, এবং এটি একটি বৈধ লক্ষ্য নিয়ে এগুতে ব্যর্থ হয়েছে।

এই নীতিমালা অনুসারে প্রত্যেক বিদেশ নাগরিক যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক তাদের অনেক আগে থেকেই সরকারের কাছ থেকে আগাম অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। এই নীতিমালা অনুসারে কোন ব্যক্তি পর্যটক, কূটনীতিক বা জাতিসংঘের কর্মী, পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করে এমন কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মী, অথবা অন্য ধরনের দর্শনার্থী– এদের সবাইকেই এই নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। বাংলাদেশি নাগরিক সহ যে কোন দর্শনার্থী যদি এই অঞ্চলের কারো সাথে বৈঠক করতে চায়, তবে কে কে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবে এবং কি বিষয়ে আলোচনা হবে এবং কি কারণে বৈঠক হচ্ছে তা উল্লেখ করে দর্শনার্থীকে একজন সরকারি কর্মকর্তার[2] কাছ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে। যদি কর্তৃপক্ষ অনুমতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে, স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে এই বৈঠকের বিষয়ে অবহিত করা হবে।

সরকারি এই নীতিমালা বিভিন্ন মানবাধিকার রক্ষাকবচের প্রকাশ্য লঙ্ঘন।

- **চলাফেরার স্বাধীনতা**

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর), যেটিতে বাংলাদেশ 2000 সালে যোগদান করে, এই বলে নিশ্চয়তা দেয় যে, “আইনত একটি রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে সবাই চলাফেরার স্বাধীনতার অধিকার এবং বাসভবন নির্ধারণ করার স্বাধীনতা’র অধিকার ভোগ করে” (ধারা ১২ (১))। আন্তর্জাতিক চুক্তিটি এই নিশ্চয়তা দেয় যে, “আইন দ্বারা উপলব্ধ, যা জাতীয় নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা (*ordre public*), জনস্বাস্থ্য বা নৈতিকতা বা অন্যদের অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ রক্ষার প্রয়োজন, এবং বর্তমান চুক্তিতে স্বীকৃত অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের উপর কোন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না”। যেহেতু এই ধারাটি এটা উল্লেখ করে “আইনত একটি রাষ্ট্র সীমানার মধ্যে সবাই”, এটি বাংলাদেশে বর্তমানে আইনত যেসব বিদেশি নাগরিক রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

- **আইনগত অবস্থান**

আইসিসিপিআর এটা স্পষ্ট করেছে যে, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতার অধিকারের উপর আরোপিত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থার বিধান রাখতে হবে।[3] বিধিনিষেধ সংক্রান্ত এই তালিকা একটি আইন নয়, কিন্তু একটি নীতিমালা; এটি একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আলোচ্য বিষয়বস্তুর তালিকা। অতএব এটা নিয়ে আইনসভায় বাছাই ও বিতর্ক হয় নি, এবং এই নীতিমালার কোন আইনগত ভিত্তি নেই। যাইহোক, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক সাক্ষাৎকার নেয়া স্থানীয় পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, এই নীতিমালা চাপিয়ে দেয়া হবে, এবং এই মেমো লঙ্ঘনকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকতে দেয়া হবে না।

---

[2] জেলা প্রশাসক, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন কর্মকর্তা; পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলার প্রতিটিতে একজন করে এরকম কর্মকর্তা রয়েছেন।

[3] যথাক্রমে, চলাফেরার স্বাধীনতার অধিকার, সমাবেশ ও সংগঠন করার অধিকারের জন্য, বিধিনিষেধ অবশ্যই “আইনে প্রদত্ত” (ধারা ১২(৩); “আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ” (ধারা ২১); “আইন দ্বারা নির্ধারিত” (ধারা ২২ (২)) হতে হবে।

- **সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতা**

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ এবং সভা অনুষ্ঠানের উপর বেআইনি বিধিনিষেধ আরোপ করে, এই নীতিমালা আইসিসিপিআর এর ধারা ২১ কর্তৃক সংরক্ষিত শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার স্বাধীনতার অধিকার, ধারা ২২ কর্তৃক সংরক্ষিত সংগঠন করার স্বাধীনতার অধিকারের বিরুদ্ধাচরণ করছে। যদি একটি সরকার এইসব অধিকারের উপর বাধানিষেধ চাপিয়ে দিতে চায়, তা অবশ্যই চলাফেরার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করার মত কঠোরভাবে প্রয়োজনীয়[4] হতে হবে। বাংলাদেশ সরকার এরকম কোন কাজ করেছে বলে কিছু দেখায়নি।

- **মতপ্রকাশের স্বাধীনতা**

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি উল্লেখ করেছে যে, এটি সাধারনত আইসিসিপিআর এর ধারা 19 এর লঙ্ঘন, যখন রাষ্ট্র চলাফেরার স্বাধীনতা, যেমন সাংবাদিক ও মানবাধিকার তদন্তকারীদের জন্য, বিশেষ করে সেইসব স্থানে যেখানে মানাবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে[5] (পরিষ্কারভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে এরূপ ঘটনা ঘটছে – দেখুন, *অন্যান্যের মধ্যে (inter alia)*, আমাদের ২০১৩ সালের প্রতিবেদন 'কিনারায় ঠেলে দেয়া হয়েছেঃ বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের অধিকার অস্বীকার')[6]।

- **গোপনীয়তা এবং পারিবারিক জীবনের অধিকার**

আইসিসিপিআর এর ধারা ১৭ মতে 'কাউকে তার গোপনীয়তা, পরিবারের ...... বিষয়ে খেয়ালখুশীমত বা বেআইনী হস্তক্ষেপ করা যাবে না'।[7] এটা বিশেষ করে উদ্বেগজনক যে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত বিদেশী নাগরিক যাদের পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বাস করে, যাদের বাংলাদেশী নাগরিকত্ব নেই, তাদেরকে পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। উপরন্তু, যেহেতু কোন ধরনের সাক্ষাতের জন্য অনুমতির দরকার হবে (এমনকি বাংলাদেশী নাগরিকদের দ্বারাও) সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই, সেহেতু যখন কেউ - এমনকি বাংলাদেশী নাগরিকত্বের অধিকারীরা পারিবারিক সদস্যদের বিবাহ এবং শেষকৃত্যর অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে থেকে যোগ দিতে চাইবে, তাদের উপর এই নীতিমালা প্রয়োগের একটি ঝুঁকি রয়েছে।

- **আইনহীনতা**

এই নীতিমালায় এটা বলা হয়নি যে কোন মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমন সংক্রান্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। এই ভাবে এই নীতিমালা আইনহীনতা এবং স্বচ্ছতার অভাবের জন্য শর্ত তৈরি করে যা আইসিসিপিআর এর ধারা ১২ লঙ্ঘন করার মত অবস্থা গঠন করে।[8]

---

[4] আইসিসিপিআর (ICCPR), ধারা ২১ এবং ২২ (২)।

[5] মানবাধিকার কমিটি, মতামত ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতার বিষয়ে, সাধারণ মন্তব্য ৩৪, সিসিপিআর/ সি / জিসি /৩৪, (CCPR /C/GC/34), অনুচ্ছেদ ৪৫।

[6] https://www.amnesty.org/en/documents/ASA13/005/2013/en/

[7] 'বেআইনী' বলতে এখানে বোঝান হয়েছে, 'কোন হস্তক্ষেপ আইন দ্বারা বিবেচিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে ঘটতে পারেনা'। অনুচ্ছেদ ৩ এর ধারা ১৭ এর উপর মানবাধিকার কমিটির সাধারণ মন্তব্য।

[8] মানবাধিকার কমিটি, চলাফেরার স্বাধীনতার বিষয়ে সাধারণ মন্তব্য ২৭, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, অনুচ্ছেদ ১৩।

- **আনুপাতিকতা ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি**

এই নীতিমালা বিভিন্ন অধিকারের সীমাবদ্ধতার কারণ হিসাবে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি উপস্থাপন করেনা, এটা অধিকারসমূহর সীমাবদ্ধতার জন্য একটি অনুমোদনযোগ্য উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে না, কোন যুক্তি প্রদান করে না যে কেন এটা প্রয়োজনীয়, কিংবা তারা আনুপাতিকতা নীতির সঙ্গে কিভাবে সামঞ্জস্য তাও ব্যাখ্যা করে না। এটি ব্যাখ্যা করে না যে কিভাবে গৃহীত উদ্দেশ্য অর্জন করা হবে, অথবা ব্যাখ্যা করে না যে অভীষ্ট ফল পেতে কেন গৃহীত ব্যবস্থা সমূহ ন্যুনতম প্রতিবন্ধক। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি বর্ণনা করেছে যে স্বাধীনভাবে চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা স্থাপন করার সময় এই উপাদানসমূহ পূরণ করা আবশ্যক।[9]

- **বৈষম্য**

যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম একচেটিয়াভাবে আদিবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত নয়, নীতিমালার শিরোনাম নির্দেশ করে যে, এটির প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে "উপজাতি" ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈঠক করার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা (২০১০ সাল থেকে, বাংলাদেশ সরকার দেশে আদিবাসীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে আসছে এবং পরিবর্তে "উপজাতি" শব্দটি ব্যবহার করে আসছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার ৫১.৪% আদিবাসী)। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অনুপাতে আদিবাসীদের অনুপাত ১.৫%। অতএব যে কোন ব্যবস্থা যা শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রভাবিত করে তার একটি উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপাতহীন প্রভাব থাকবে সমস্ত বাংলাদেশের আদিবাসীদের উপর। যেহেতু বাংলাদেশ সরকার এখনও পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যা দেয়নি যে পার্বত্য চট্টগ্রামে কেন এই যোগাযোগের স্বাধীনতার উপর সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা প্রয়োজন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বাস করে যে এই ব্যবস্থার প্রভাব আদিবাসীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক।

এছাড়াও এই নীতিমালা আদিবাসীদের "নিজেদের সদস্যদের পাশাপাশি অন্যান্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং স্থাপন, সম্পর্ক ও সহযোগিতা ও আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্যে"[10] যোগাযোগের উপর একটি অহেতুক সীমাবদ্ধতা তৈরি করে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এর আদিবাসী জনগোষ্ঠী মিয়ানমার ও ভারতের আদিবাসীদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই নীতিমালায় নির্দিষ্ট করে আইন দ্বারা বর্ণিত সঠিক কোন বিষয় না থাকলেও, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে আদিবাসী জনগোষ্ঠী – বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকা এবং প্রতিবেশী দেশগুলো উভয়েরই– আদিবাসী আত্মীয়দের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ বা বৈঠকের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা অলিখিত আইনের মতই গন্য হবে।

আমি এই ক্ষেত্রে আপনার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, এবং এই বিষয়ে আপনার একটি প্রতিক্রিয়া পেলে খুব কৃতজ্ঞ থাকবো।

আপনার অনুগত,

ডেভিড গ্রিফিথস

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল - আন্তর্জাতিক সচিবালয়

---

[9] *পূর্বের উৎস,* অনুচ্ছেদ ১৪-১৫।

[10] জাতিসংঘের আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র, ধারা ৩৬(১)।

দক্ষিণ এশিয়ার গবেষণা পরিচালক ও ট্রানজিশন লিড

অনুলিপিঃ

প্রধানমন্ত্রীর অফিস
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।